আলকেমিস্ট

পাউলো কোয়েলো

প্রকাশক
ক্যারিয়ার ইনটেলিজেন্স
হোল্ডিং : ৯৩, ওয়ার্ড : ৭,
ব্লক : ডি, রোড : ৪, কলমা দক্ষিণ
সাভার, ঢাকা-১৩৪১

পরিবেশক
কালো
২২ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট
কাঁঠালবাগান, ঢাকা

প্রথম মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

শুভেচ্ছা মূল্য
২০০ (দুই শ') টাকা মাত্র

পাউলো কোয়েলোর সাড়া জাগানো বই আলকেমিস্টের বাংলা অনুবাদ পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

বইটির কথা প্রথম যখন মোহাম্মদ হাসান শরীফ ভাইয়ের কাছে শুনলাম তখনই বেশ আগ্রহ অনুভব করলাম। ভাবলাম বইটির অনুবাদ হওয়া উচিত। বইটি প্রকাশের আগ্রহ দেখালে অনুবাদে রাজি হলেন তিনি। এরপর অনুবাদ করে পাণ্ডুলিপিও হস্তান্তর করলেন। কিন্তু নানামুখী ব্যস্ততায় প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছে। সেজন্য অনুবাদকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।

বইটি মূলত উপন্যাস। তবে এর প্রতিটি লাইনই শিক্ষণীয়। স্বপ্ন পূরণের সংগ্রামে কিভাবে অবিচল থাকতে হয়, কিভাবে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয় তা-ই প্রতিধ্বনিত হয়েছে এতে।

বইটি প্রকাশে আমার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান জিটিএফসি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদেরআগ্রহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাদের কাছে বইটির কথা বলার পর থেকে নিয়মিত এটির অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছে। কবে হাতে পাবে তা জানতে চেয়েছে। সেজন্য তাদের প্রতি শুভ কামনা।

মোশাহিদ ভাইয়ের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা। তিনি তার প্রকাশনা সংস্থা কালো থেকে বইটি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছেন। এছাড়া প্রকাশনার ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

বইটি পড়ে পাঠক তার স্বপ্ন পূরণে প্রত্যয়ী হলেই আমরা সার্থক। সবাইকে অশেষ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

মো. বাকীবিল্লাহ
সম্পাদক ও প্রকাশক
ক্যারিয়ার ইনটেলিজেন্স
৯ জানুয়ারি ২০১৮

Alchemist by Paulo Coelho. From English Version by HarperCollins Publishers, Translated by Md. Hasan Sharif and Published by Career Intelligence. Holding : 93 (Mir Bari); Ward : 7; Block : D; Road No : 4; Kalma South, Savar, Dhaka-1341. Phone : +880-1911895968, +8801841895968
www.careerintelligencebd.com

বাংলা সংস্করণ উৎসর্গ

ফাতিমা : স্বপ্নের মানুষকে যে স্বপ্নের দিকে ছুটতে উদ্দীপ্ত করে

কেন এই অনুবাদ?

বইটি পড়ামাত্র আমার মনে হয়েছে, এর বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। খোঁজ নিয়ে কোনো অনুবাদের সন্ধান পেলাম না। কেউ যদি কাজটা না করে থাকে, তবে অপেক্ষায় না থেকে আমিই করি না কেন? শুরু করলাম। শেষ পর্যায়ে এসে জানতে পারলাম, একটি নয়, বেশ কয়েকটি অনুবাদ বাজারে রয়েছে। তার পরও বাকিটুকু শেষ করেছি। হয়তো এই চেষ্টা ওই সংখ্যাটিকেই একটু বড় করেছে মাত্র।

আরব বিজ্ঞানীরা লোহাকে সোনায় পরিণত করা যায়- এমন একটি বস্তু আবিষ্কারের চেষ্টা চালাতে গিয়ে কেমিস্ট্রি (আলকেমি বা রসায়ণ শাস্ত্র) সৃষ্টি করেছেন। এই প্রয়াস আসলে সাধারণ জিনিসকে পরিশোধন করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। প্রতিটি মানুষেরও দায়িত্ব নিজেকে প্রতিনিয়ত পরিশোধন করে সৃষ্টির সেরায় রূপান্তরিত করা। প্রত্যেককেই তার সাধ্যের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে, তার গন্তব্যে পৌঁছতেই হবে। পৃথিবীতে এটাই তার মিশন।

আলকেমিস্ট ওই প্রেরণাই সৃষ্টি করেছে। কোনো মানুষ যেখানেই থাকুক, ছোট বা বড় যে পদেই অবস্থান করুক, তাকে স্বপ্নের ঠিকানায় যাওয়ার চেষ্টা করতেই হবে। চলার পথে সামনে আসা নানা প্রলোভন দমন করতে হবে। অনেক সময় মনে হবে, বঞ্চিত হচ্ছি, কিন্তু চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত যে প্রাপ্তি, তা কল্পনাকেও হার মানাবে।

দীন মোহাম্মদ ভাইয়ের ঋণ পরিশোধের কোনোই উপায় নেই। তিনিই আরো অনেক কিছুর মতো বইটির সন্ধান দিয়েছেন। এমনকি এক কপি উপহারও দিয়েছিলেন। পড়ে আমার মনে হয়েছে, না পড়লে বড় কিছু মিস করতাম।

সাবরিনা সোবহানের কাছেও কৃতজ্ঞ থাকব। পরিমার্জনার কঠিন কাজে তার সর্বাত্মক সহায়তা, সহযোগিতা কখনো ভোলার নয়। এ ধরনের সহযোগিতা পেলে আরো বড় কাজও হাতে নেয়া যায়।

বইটি প্রকাশে এগিয়ে আসার জন্য মো. বাকীবিল্লাহকে ধন্যবাদ। অনুবাদ করলেই তো হবে না, প্রকাশ করতে হবে। আমার প্রকাশকদের সাথে যোগাযোগ করব কিনা যখন ভাবছিলাম, তখন তিনিই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

মোহাম্মদ হাসান শরীফ
ঢাকা, বাংলাদেশ

লেখকের কথা

আমেরিকান প্রকাশক হার্পার কলিন্সের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার ঘটনাটি মনে পড়ছে। তিনি লিখেছিলেন : '*আলকেমিস্ট* পড়াটা এমন যে - আমি ভোরে ঘুম থেকে ওঠে সূর্যোদয় দেখছি, আর বাকি দুনিয়া এখনো ঘুমিয়ে আছে।' আমি বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। মনে মনে বললাম - 'অর্থাৎ বইটির অনুবাদ হতে যাচ্ছে!' ওই সময় আমি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে, নিজের পথে চলতে হিমশিম খাচ্ছিলাম। অবশ্য তখনো সবাই আমাকে এক সুরে বলছিল, অসম্ভব।

তারপর একটু একটু করে আমার স্বপ্ন ধরা দিতে শুরু করল। ১০, ১০০, ১০০০, ১০ লাখ কপি বিক্রি হলো আমেরিকায়। একদিন ব্রাজিলের এক সাংবাদিক আমাকে ফোন করে জানালেন - প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন আমার এ বইটি পড়া অবস্থায় ছবি প্রকাশ করেছেন। কয়েক দিন পর আমি তখন তুরস্কে, *ভ্যানিটি ফেয়ার* ম্যাগাজিন খুলে দেখতে পেলাম, জুলিয়া রবার্টস ঘোষণা করছেন, তিনি বইটি পড়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছেন। মিয়ামির রাস্তায় একাকী হাঁটার সময় শুনতে পেলাম, এক মেয়ে তার মাকে বলছে : 'তুমি অবশ্যই *আলকেমিস্ট* পড়বে!'

বইটি ৬১টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বিক্রি হয়েছে তিন কোটিরও বেশি কপি। লোকজন প্রশ্ন করতে শুরু করেছে : এ ধরনের বিপুল সাফল্যের রহস্য কী? এর একমাত্র সত্য জবাব হলো - আমি জানি না। আমি যা জানি তা হলো, রাখালছেলে সান্তিয়াগোর মতো আমাদের সবারই দরকার নিজের অন্তরাত্মার আহ্বানে সাড়া দেওয়া।

অন্তরাত্মার আহ্বান বলতে কী বুঝায়? তা হলো ঈশ্বরের আশীর্বাদ। পৃথিবীতে তোমার জন্য ঈশ্বর এ পথটিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমরা যখনই কিছু করি, তা আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করলে বুঝতে হবে, আমরা আমাদের রূপকল্প অনুসরণ করছি। অবশ্য নিজের স্বপ্নের মুখোমুখি হওয়ার সাহস সবার নেই। কেন?

চারটি বাধা রয়েছে। প্রথমত, একেবারে শৈশব থেকেই আমাদের বলা হচ্ছে, আমরা যা-ই করতে চাই না কেন, তা করা অসম্ভব। আমরা এই ধারণা নিয়ে বড় হই। সময় যত গড়াতে থাকে, বদ্ধমূল সংস্কার, ভীতি ও অপরাধবোধের আবরণ তত পুরু হতে থাকে। তারপর এমন একটা সময় আসে, যখন আন্তরাত্মার আহ্বান এত গভীরে চাপা পড়ে যায় যে, তা আর দেখা যায় না। কিন্তু তখনো সে সেখানে থাকে।

আমাদের চাপা পড়া স্বপ্ন যদি খুঁড়ে বের করে আনার সাহস থাকে, তবে আমরা দ্বিতীয় বাধার মুখে পড়ি। সেটা হলো - ভালোবাসা। আমরা জানি, আমরা কী চাই। কিন্তু আমাদের স্বপ্নের পেছনে ছুটতে গিয়ে সবকিছু ত্যাগ করলে আমাদের আশপাশে থাকা লোকজন কষ্ট পাবে ভেবে ভয় পাই। আমরা বুঝতে পারি না যে, ভালোবাসা হলো স্রেফ আরেকটু গতিবেগের সঞ্চার। সেটা কোনোভাবেই আমাদের সামনে এগিয়ে চলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। আমরা বুঝি না, যারা আন্তরিকভাবে আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, তারা আমাদের সুখী দেখতে চান, এই পথচলায় আমাদের সাথে থাকতে প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

একবার যদি আমরা মেনে নেই যে, ভালোবাসা হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে চলার ব্যাপার, তখন আমরা তৃতীয় বাধার মুখে পড়ি - চলার পথে সামনে আসা বাধার কাছে পরাজয়ের ভয়। আমরা যারা আমাদের স্বপ্নের জন্য লড়াই করি, তারা সফল না হলে বেশি কষ্ট পাই। কারণ আমরা সেই পুরনো অজুহাতটির আশ্রয় না নিয়ে পারি না - 'ওহ, আসলে এটা তো কামনা করিনি।' অথচ আমরা তা কামনা করি। এবং আমরা এও জানি, আমাদের সবকিছু এতে বাজি

রেখেছি। আর অন্তরাত্মার আহ্বানের পথটি অন্য পথের চেয়ে সহজ নয়। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য এই যে অন্তরাত্মার আহ্বানের যে পথ তাতে আমাদের পুরো হৃদয় থাকে। এ কারণে আমাদেরকে অর্থাৎ আলোর যোদ্ধাদের অবশ্যই কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরতে হবে। বুঝতে হবে, মহাবিশ্ব একযোগে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো আমরা তা টের পাচ্ছি না।

আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি : পরাজয় কি অনিবার্য? আসলে অনিবার্য হোক বা না হোক, তবুও তা ঘটে। আমরা যখন প্রথম স্বপ্নের জন্য লড়াই শুরু করি, তখন আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। ফলে অনেক ভুল করে ফেলি। তবে জীবনের একান্ত যে কথাটা আছে তা হলো- সাতবার ব্যর্থ হওয়ার পর অষ্টমবার ঘুরে দাঁড়ানো।

তাহলে আমাদের অন্তরাত্মার আহ্বান শুনে যদি অন্যদের চেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতেই হয়, তবে সেই পথ মাড়ানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ? খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একবার যদি আমরা পরাজয় থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারি, এবং আমরা সবসময় তা পারি, তবে প্রচণ্ডতম উল্লাস আর প্রবল আত্মবিশ্বাসে টগবগ করে ফুটতে থাকি। হৃদয়ের শব্দহীনতায় আমরা বুঝতে পারি, আমরা জীবনের আশ্চর্য শক্তিতে নিজেদেরকে মূল্যবান হিসেবে প্রমাণ করেছি। প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা কল্যাণকর লড়াইয়ের অংশ। আমরা প্রবল উদ্দীপনা আর আনন্দ নিয়ে বাঁচতে শুরু করি। সহনীয় দুর্ভোগের চেয়ে অপ্রত্যাশিত যন্ত্রণাগুলো অনেক দ্রুত চলে যায়। সহনীয় দুর্ভোগটাই বছরের পর বছর টিকে থাকে, আমাদের অজান্তেই তা আত্মাকে বিনাশ করে দেয়। তারপর তিক্ততা থেকে মুক্ত হওয়ার আর সামর্থ্য থাকে না, এবং বাকি জীবন আমাদেরকে এর সাথেই থাকতে হয়।

আমাদের স্বপ্ন খুঁড়ে বের করে, একে পরিচর্যা করার জন্য ভালোবাসার শক্তিকে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে এবং অনেক বছর ভীতি নিয়ে বেঁচে থেকে হঠাৎ আমরা বুঝতে পারি, আমরা সবসময় কোন বিষয়টা চেয়েছি, আগামী দিনই সেটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে - এমনটাই প্রত্যাশা করেছি। তারপর আসে চতুর্থ বাধা। সেটি হলো - যে স্বপ্নকে ধরার জন্যই আমরা জীবনজুড়ে লড়াই করেছি তাকে গ্রহণ করার ভয়।

অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন : 'প্রতিটি মানুষই তার ভালোবাসার জিনিসটাকে খুন করে ফেলে।' কথাটা সত্য। কাম্য বস্তু প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ামাত্র সাধারণ মানুষের আত্মা অপরাধবোধে ভরে যায়। আমরা আশপাশে তাকিয়ে ওইসব লোককে দেখি, যারা তাদের কাম্য বস্তু অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তখন আমাদেরও মনে হতে থাকে - আমরাও ওই বস্তুটি লাভ করার অধিকার রাখি না। আমরা যেসব বাধা অতিক্রম করে এসেছি, যত দুর্ভোগ সহ্য করেছি, এ পর্যন্ত যত ত্যাগ করেছি, সবই ভুলে যাই। আমি এমন অনেক লোককে চিনি, যাদের অন্তরের আহ্বান তাদের হাতের মুঠোয় ছিল, লক্ষ্যে পৌঁছাতে মাত্র একটি ধাপ দূরে ছিল, তখনই তারা বোকার মতো একটির পর একটি ভুল করে কখনোই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

এটাই সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ এর মধ্যে আনন্দ আর জয় পরিত্যাগ করার সন্ন্যাসসুলভ মায়াবী পরশ রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি বিশ্বাস করেন, আপনি যে বস্তুটির জন্য লড়াই করেছেন, তা আপনার জন্য খুবই মূল্যবান, তবে আপনি হয়ে যাবেন ঈশ্বরের হাতিয়ার। আপনি জগতের আত্মাকে সহায়তা করবেন এবং আপনি বুঝতে পারবেন - কেন আপনি এখানে।

পাউলো কোয়েলো
রিও ডি জেনেরিও
নভেম্বর, ২০০২

মুখবন্ধ

কাফেলার কারো সাথে করে আনা একটি বই আলকেমিস্ট হাতে নিলেন। পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে নার্সিসাস সম্পর্কে একটি গল্প তার চোখে পড়ল।

নার্সিসাসের কাহিনীর সাথে আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন আলকেমিস্ট। এক তরুণ নিজের সৌন্দর্য উপভোগ করতে একটি লেকের পাড়ে উবু হয়ে বসে থাকত। সে নিজের রূপে এতই বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল যে উবু হয়ে থাকতে থাকতে এক সকালে সে লেকে পড়ে ডুবে মারা গেল। যে জায়গাটিতে সে পড়ে গিয়েছিল, সেখানে একটি ফুলের জন্ম হলো। এই ফুলকেই বলা হয় নার্সিসাস।

কিন্তু লেখক এখানেই গল্পটি শেষ করেননি।

তিনি লিখেলেন, নার্সিসাস যখন মারা গেল, তখন বনের দেবীরা এসে দেখলেন, টলটলে মিষ্টি পানিতে কানায় কানায় পূর্ণ লেকটি এখন নোনা পানিতে ভরে গেছে।

'তুমি কাঁদছ কেন?' জানতে চাইলেন দেবীরা।

'নার্সিসাসের জন্য কাঁদছি,' লেক জবাব দিল।

'আহ্, তুমি যে নার্সিসাসের জন্য কাঁদবে, তাতে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই,' তারা বললেন। 'আমরা পর্যন্ত বনে তার পেছনে ছুটতাম। তবে একমাত্র তুমিই খুব কাছ থেকে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পেরেছিলে।'

'অ্যাঁ,... নার্সিসাস সুন্দর ছিল?' লেকটি জিজ্ঞেস করল।

'এ বিষয়টি তোমার চেয়ে ভালো আর কে জানে?' অবাক হয়ে বললেন দেবীরা। 'কারণ, তোমার পাড়ে এসেই তো সে প্রতিদিন নিজের রূপে বিভোর হতো!'

কিছু সময় নীরব হয়ে রইল লেক। সবশেষে বলল -

'আমি নার্সিসাসের জন্য কাঁদছি। তবে নার্সিসাস সুন্দর ছিল কি-না তা আমি লক্ষ করিনি। কিন্তু আমি কাঁদি, কারণ প্রতিবার যখন পাড় থেকে আমার দিকে ঝুঁকত, তখন আমি তার চোখের গভীরে আমার নিজের রূপ প্রতিফলিত হতে দেখতাম।'

'কী সুন্দর গল্প,' আলকেমিস্ট ভাবলেন।

প্রথম খণ্ড

নাম তার সান্তিয়াগো। ভেড়ার পাল নিয়ে পরিত্যক্ত চার্চটির কাছে সে যখন পৌঁছল, তখন চার দিকে ঘন অন্ধকার। অনেক আগেই চার্চের ছাদ ভেঙে পড়েছে। যেখানে একসময় পবিত্র বস্তুগুলো রাখা হতো, সেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক ডুমুরগাছ।

রাতটি সেখানেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো ছেলেটা। ভাঙা দরজা দিয়ে সব ক'টা ভেড়াকে ভেতরে ঢোকাল। তারপর সে নিজে ভেতরে প্রবেশ করল। কয়েকটি তক্তা আড়াআড়ি রেখে দরজা বন্ধ করে দিলো। এই এলাকায় নেকড়ে নেই। তবে কোনো ভেড়া রাতে যাতে ঘুরতে বের হতে না পারে সেজন্যই এ ব্যবস্থা। যদি কোনোটি একবার বের হতে পারে, তবে পরের সারাটি দিন যাবে সেটি খুঁজতে।

নিজের জ্যাকেট দিয়েই মেঝে ঝাড়ল সে। তারপর সবেমাত্র শেষ করা বইটিকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়ল। মনে মনে বলল - তাকে আরো মোটা বই পড়তে হবে : যত মোটা, তত টেকসই, বালিশ হিসেবে আরো আরামদায়ক।

যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। আধ-ভাঙা ছাদ দিয়ে ঝিলিমিলি তারা দেখা যাচ্ছিল।

আরেকটু ঘুমাতে পারলে ভালো হতো, ভাবল সে। এক সপ্তাহ আগে ঠিক এই স্বপ্নটিই দেখেছিল। তখনো স্বপ্ন শেষ হওয়ার আগেই জেগে গিয়েছিল।

গাঝাড়া দিয়ে উঠল, লাঠিটি নিয়ে তখনো ঘুমিয়ে থাকা ভেড়াগুলোকে জাগাতে শুরু করল। লক্ষ্য করল, সে জেগে ওঠামাত্র বেশির ভাগ ভেড়াও পিট পিট করে তাকাতে শুরু করে দিয়েছে। দুই বছর ধরে সে ভেড়াগুলোর সাথে আছে। মনে হচ্ছে, কোনো এক রহস্যময় শক্তি ভেড়ার পালের সাথে তার জীবনকে জুড়ে দিয়েছে। আর সে খাবার আর পানির খোঁজে গ্রামের পথ বেয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 'তারা আমার ব্যাপারে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, আমার সময়সূচিও তারা জানে,' - বিড়বিড় করে বলল সে। এক মিনিট চিন্তা করে তার মনে হলো, বিষয়টি অন্য রকমও হতে পারে। সে নিজেই আসলে *তাদের* ধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

অবশ্য, কয়েকটি ভেড়ার ঘুম ভাঙতে কিছু বেশি সময় নেয়। ছেলেটা তার লাঠি দিয়ে সেগুলোকে একটি করে খোঁচা দিতে লাগল, তবে প্রতিটির নাম ডেকে ডেকে। তার ধারণা, সে যা বলে ভেড়ারা বোঝে। তাই সে বই পড়তে পড়তে ভালো লাগা অংশগুলো মাঝে মাঝে তাদেরও শোনায়। সে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো রাখালের একাকিত্বের কথা বলে; তার সুখের কথা জানায়; অনেক সময় ছেড়ে আসা গ্রামে সে যা কিছু দেখেছে, সেগুলো সম্পর্কে তার অভিমত প্রকাশ করে।

তবে কয়েক দিন ধরে ভেড়াদেরকে সে কেবল একটি কথাই বলে চলেছে : ওই মেয়েটির কথা। আর মাত্র চার দিন পর সে মেয়েটির গ্রামে যাবে ভেড়ার পশম বেচতে। মাত্র একবারই ওই গ্রামে গিয়েছিল সে। এক বছর আগে। মেয়েটির বাবা মুদি দোকানের মালিক। বেশ চালাক। কেউ যাতে তাকে ঠকাতে না পারে, সেজন্য তার সামনেই ভেড়ার পশম ছাঁটতে হয়। এক বন্ধুর কাছ থেকে খবর পেয়ে সে ভেড়াদের নিয়ে গিয়েছিল ওই দোকানির কাছে।

***

‘আমি কিছু পশম বেচতে চাই,’ - ছেলেটা বলেছিল দোকানিকে।

দোকানে তখন বড্ড ভিড়। লোকটি তাকে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। সময় কাটাতে সে দোকানের সিঁড়িতে বসে ব্যাগ থেকে বই বের করল।

‘রাখাল বালকেরাও পড়তে পারে, আমার জানা ছিল না,’- একটি মেয়ে কথা বলে উঠল তার পেছন থেকে।

মেয়েটাকে দেখলেই বোঝা যায়, সে আন্দালুসিয়া এলাকার। তার ঢেউ খেলানো কালো চুল আর চোখ দুটি অস্পষ্টভাবে মুরিশ বিজয়ীদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

‘আসলে কী, বইয়ের চেয়ে আমার ভেড়াগুলোর কাছ থেকেই অনেক বেশি শিখি,’ - জবাব দিয়েছিল ছেলেটা। তারা দুই ঘণ্টা কথা বলেছিল। মেয়েটা জানিয়েছিল, ওই দোকানি তার বাবা। সে তাদের গ্রামের গল্প করছিল, বলেছিল, এখানকার প্রতিটি দিনই অন্য দিনের মতো। রাখালবালক তাকে আন্দালুসিয়া এলাকার প্রান্তরগুলোর কথা শুনিয়েছিল। অন্য যেসব শহরে সে গেছে, সেখানকার কথা বলেছিল। ভেড়ার বদলে অন্য কারো সাথে কথা বলতে পারা ছিল খুব আনন্দের।

‘তুমি কিভাবে পড়তে শিখেছ?’ মেয়েটা একপর্যায়ে জিজ্ঞাসা করল।

‘অন্য সবাই যেভাবে শেখে,’ তার জবাব। ‘স্কুলে।’

‘আচ্ছা, তুমি যদি পড়তেই জানো, তবে এই রাখালগিরি করছ কেন?’

ছেলেটা বিড়বিড় করে কিছু একটি জবাব দিলো। এ করেই প্রসঙ্গ পাল্টাবার সুযোগ পেয়ে গেল। সে নিশ্চিত ছিল, মেয়েটা কিছুই বুঝতে পারেনি। সে তার সফরনামা বলে চলল, আর মেয়েটির মুরিশ চোখদুটি ভয় আর বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠছিল। সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছিল, ছেলেটার মনে ততই ইচ্ছা জাগছিল, দিনটি যেন কোনোভাবেই শেষ না হয়, মেয়েটির বাবা যেন ব্যস্তই থাকেন, তাকে যেন তিনটি দিন অপেক্ষায় রাখেন। সে বুঝতে পারল, সে নিজের মধ্যে নতুন কিছু অনুভব করছে। জীবনে এই প্রথমবার এক স্থানে চিরদিনের জন্য থেকে যাওয়ার বাসনা জেগেছিল মনে। ঝলমলে কালো চুলের মেয়েটা তাকে বদলে দিয়েছে। তার দিনগুলো আর কখনো আগের মতো হবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোকানি এসে পড়লেন। তিনি ছেলেটাকে চারটি ভেড়ার পশম ছাঁটতে বললেন। পশমের দাম দিয়ে আগামী বছরও তাকে আসতে বললেন।

***

আর চার দিন পর ওই গ্রামেই পৌঁছবে সে। তার ভেতরে শিহরণ ছিল, একইসাথে অস্বস্তিও লাগছিল। প্রশ্ন জাগছিল, মেয়েটা কি তাকে ভুলে গেছে? অনেক রাখালই তো সেখানে যায় পশম বেচতে।

‘ভুলে গেলে যাক গে, তাতে আমার কী আসে-যায়,’ সে তার ভেড়াকে বলল। ‘আমি নানা জায়গার অনেক মেয়েকে চিনি।’

মুখে সে যা-ই বলুক না কেন, তার মন ঘুরপাঁক খাচ্ছিল মেয়েটিকে নিয়েই। মেয়েটিকে সে হারাতে চায় না। আর সে জানে, নাবিক আর হকারদের মতো রাখালরাও কোনো একটি শহরে এমন কাউকে খুঁজে পায়, যে তাদের বেপরোয়া ঘোরাঘুরির আনন্দ ভুলিয়ে দিতে পারে।

ভোর হচ্ছিল। ছেলেটা ভেড়াগুলোকে সূর্যের দিকে মুখ করে চালাতে লাগল। তার মনে হলো, ভেড়ারা কখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। হয়তো এ কারণেই তারা সবসময় আমার খুব কাছে থাকে।

ভেড়াদের মাথায় থাকে কেবল খাবার আর পানির চিন্তা। ছেলেটা যত দিন আন্দালুসিয়ার সেরা প্রান্তরগুলোর কথা জানবে, তত দিন তারা তার বন্ধু থাকবে। তাদের দিনগুলো সবই একরকম, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দৃশ্যত সীমাহীন সময়। তারা তাদের শৈশবে কখনো একটি বইও পড়েনি। শহরে যা যা দেখে ছেলেটা তাদের জানিয়েছে, তারা এর কিছুই বুঝতে পারেনি। কেবল খাবার আর পানির কথা ভেবেছে। বিনিময়ে তারা উদারভাবে পশম দিয়ে যাচ্ছে, আর দিচ্ছে সঙ্গ এবং মাঝে মাঝে তাদের মাংস।

ছেলেটার ভাবল, আমি আজ দৈত্য হয়ে তাদেরকে একটি একটি করে জবাই করতে থাকি, তবে কী হবে? মনে হয় - ভেড়াগুলোর বেশির ভাগই মারা যাওয়ার আগে বুঝতেই পারবে না, তাদের জীবন শেষ হতে চলেছে। তারা আমাকে বিশ্বাস করে। আমি তাদের খাবারের ব্যবস্থা করি বলেই তারা নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকার বুদ্ধি খুইয়ে ফেলেছে।

নিজের জ্ঞানী জ্ঞানী ভাবনায় হতবাক হয়ে গেল সে। যে চার্চে সে রাত কাটাল, সেখানকার কিছু একটি তার ওপর আছর করেনি তো! এখানে থাকতে গিয়েই তো সে দ্বিতীয়বার স্বপ্নটি দেখল। আর তাতেই তার বিশ্বস্ত সঙ্গীদের ওপর রাগ জমল। আগের রাতে খাবারের পর যে মদ রয়ে গিয়েছিল, সে তা থেকে কিছুটা পান করল। জ্যাকেটটি শরীরের সাথে আরো ভালো করে জড়িয়ে নিলো। সে জানে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সূর্য ঠিক মাথার উপরে উঠে আসবে। তখন এত গরম পড়বে যে, তার পক্ষে মাঠ দিয়ে চলা সম্ভব হবে না। গ্রীষ্মকালে দিনের এই সময় স্পেনের সবাই ঘুমিয়ে কাটায়। রাত না নামা পর্যন্ত তাপ থাকে। ওই পুরো সময় তাকে জ্যাকেট সাথে রাখতে হয়। গরমের সময় জ্যাকেটের ওজন যখন বোঝা মনে হয়, তখন সে ভাবে - ভোরের ঠাণ্ডা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য আছে এই জ্যাকেট।

আমাদেরকে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়, সে ভাবল। সাথে সাথেই জ্যাকেটটির ওজন আর উষ্ণতা স্বস্তিদায়ক হলো।

জ্যাকেটটির একটি উদ্দেশ্য আছে, ঠিক যেমন আছে ছেলেটারও। তার জীবনের উদ্দেশ্য হলো ঘুরে বেড়ানো। দুই বছর ধরে আন্দালুসিয়ার প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে সে এই অঞ্চলের সব শহর চিনে ফেলেছে। সে পরিকল্পনা করছে, এবার গিয়ে সে মেয়েটাকে বলবে, কিভাবে একটি সাধারণ রাখাল পড়তে শিখেছিল। ঘটনা হলো, সে ১৬ বছর পর্যন্ত স্কুলে পড়াশোনা করেছিল। তার মা-বাবা চেয়েছিলেন, তাদের ছেলে পাদ্রি হবে। সেটা হলে, তা হবে এই চাষী পরিবারের গর্বের কারণ। তারাও কেবল খাবার আর পানির জন্যই ভেড়ার মতো কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। সে ল্যাতিন, স্প্যানিশ আর ধর্মতত্ত্ব পড়েছে। কিন্তু একেবারে শৈশব থেকেই সে দুনিয়াকে জানতে চেয়েছে। ঈশ্বরকে জানা আর মানুষের পাপগুলো শেখার চেয়ে এটি তার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। অনেক সাহসে ভর করে এক বিকেলে সে বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলল, সে পাদ্রি হতে চায় না। সে ঘুরে বেড়াতে চায়।

***

‘বাবা, সারা দুনিয়ার মানুষ আমাদের এই গ্রাম দিয়ে পথ চলে,’ - বাবা বলেছিলেন। ‘তারা নতুন কিছুর খোঁজ করে। কিন্তু তারা যখন চলে যায়, তখন যেমন মানুষ হিসেবে এসেছিল, ঠিক তেমন মানুষ হিসেবেই ফিরে যায়। তারা প্রাসাদ দেখার জন্য পাহাড়ে চড়ে, কল্পনার ফানুস উড়িয়ে ভাবে, আগেকার দিন কতই না ভালো ছিল। তাদের ছিল সোনালি চুল, গাঢ় ত্বক। আসলে ঠিক এখন আমরা যেমন আছি, তারা তেমন লোকই ছিল।’

‘কিন্তু শহরের যেসব প্রাসাদে তারা থাকত, আমি সেগুলো দেখতে চাই,’ ছেলেটা বলেছিল।

‘ওইসব লোক আমাদের এলাকা দেখে বলে, তারা এখানে সারা জীবন থাকতে চায়,’ বাবা জবাব দিলেন।

‘আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাদের এলাকা দেখতে চাই, বুঝতে চাই তারা কিভাবে বাস করত,’ ছেলে বলল।

‘এখানে যারা আসে, তাদের কাছে খরচ করার মতো অনেক টাকা থাকে। এ কারণেই তারা ঘোরাফেরার ব্যয় মেটাতে পারে,’ বাবা বলেছিলেন। ‘আমাদের মধ্যে যারা রাখালগিরি করে, কেবল তারাই ঘুরে বেড়াতে পারে।’

‘তাহলে আমি রাখালই হব!’

বাবা আর কথা বলেননি। পর দিন তিনি ছেলেকে একটি থলেতে ভরে তিনটি প্রাচীন স্প্যানিশ স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন।

‘এগুলো একদিন মাঠে পেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, এগুলো হবে তোমার উত্তরাধিকারের অংশ। যা-ই হোক, এখন এগুলো দিয়ে একটি ভেড়ার পাল কিনে ফেলো। তারপর চলে যাও মাঠে। কোনো এক দিন তুমি বুঝতে পারবে, এই পল্লীভূমি সেরা, আর আমাদের নারীরা সবচেয়ে সুন্দরী।’

তিনি ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন। ছেলেটা তার বাবার চোখে ভালো করে তাকালে দেখতে পেত, সেখানেও রয়েছে দুনিয়া দেখার সক্ষমতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা- ওই আকাঙ্ক্ষা তখনো সজীব ছিল, যদিও অনেক বছরের ব্যাপ্তিতে তাকে ওই আকাঙ্ক্ষা কবর দিতে হয়েছিল রোজকার খাবার, পানীয় আর প্রতি রাতে একই জায়গায় ঘুমানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য।

***

দিগন্ত রক্তিম হয়ে উঠল, হঠাৎ করেই যেন মাথার ওপর হাজির হলো সূর্য। ছেলেটা তার বাবার সেই স্মৃতি মনে করে খুশি হলো। এর মধ্যেই সে অনেক দুর্গ দেখে ফেলেছে, অনেক নারীর সাক্ষাৎ পেয়েছে (যদিও তাদের কেউই, আর কয়েক দিন পর যার সাথে দেখা হওয়ার কথা রয়েছে, তার মতো নয়)। সে একটি জ্যাকেটের মালিক, একটি বই আছে। এই বইটি বদল করে আরেকটি পেতে পারে। আর আছে একপাল ভেড়া। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো - প্রতিটি দিন সে তার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। আন্দালুসিয়ার মাঠ-ঘাট আর ভালো না লাগলে সে তার সব ভেড়া বিক্রি করে জাহাজও ধরতে পারে। এর মধ্যেই তার সাগর নিয়ে অনেক কিছু ভাবা হয়ে গেছে। অনেক নগরী, অসংখ্য নারী এবং খুশি হওয়ার অনেক সুযোগও সে জেনে গেছে। সূর্য ওঠা দেখতে দেখতে সে ভাবল - গির্জায় গিয়ে ঈশ্বরকে আমি পেতাম না।

যখনই সে পারে, চেষ্টা করে নতুন পথে চলতে। আগে কখনোই সে ওই ভাঙা চার্চে যায়নি, যদিও অনেকবারই সে ওই এলাকার বিভিন্ন অংশে গেছে। দুনিয়াটা বিশাল, অফুরন্ত। তাকে কেবল যা করতে হয় তা হলো- ভেড়াগুলোকে পথে ঠেলে দিয়ে দারুণ কিছু আবিষ্কারে বিভোর হয়ে যাওয়া। সমস্যা হলো- ভেড়ারা বুঝতেই পারে না, তারা প্রতিদিন নতুন পথে হাঁটছে। তারা দেখে না, মাঠগুলো নতুন, মওসুম বদলে গেছে। তারা কেবল খাবার আর পানি নিয়েই ভাবে।

হয়তো আমরা সবাই এরকমই, ছেলেটার মনে হলো। এমনকি আমিও তো মুদি দোকানির মেয়েকে দেখার পর আর কোনো নারীর কথা ভাবছি না। সূর্যের দিকে তাকাল সে। হিসাব করে দেখল, দুপুরের আগে তারিফায় পৌঁছানো সম্ভব। সেখানে তার বইটি বদলে আরো ভারী একটি নিতে পারবে, বোতলে মদ ভরতে পারবে, চুল-দাড়ি কামিয়ে মেয়েটির সাথে দেখা করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে। সে ভাবতে চাইল না যে, তার আগেই হয়তো অন্য কোনো রাখাল আরো বেশি ভেড়া নিয়ে ওই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য সেখানে পৌঁছে গেছে।

তার ভাবনায় এলো, এটা খুবই সম্ভব যে, একটি স্বপ্ন সত্যি হয়ে জীবনকে সুন্দর করে দেবে। সে সূর্য কত দূর উঠল তা দেখে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো। হঠাৎই তার মনে পড়ল, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেন এমন এক বৃদ্ধা থাকেন তারিফায়।

***

ছেলেটাকে ওই নারী তার বাড়ির পেছনের একটি কামরায় নিয়ে গেলেন। একটি রঙিন পুঁতির পর্দা দিয়ে বসার ঘর থেকে আলাদা করা। রুমে আছে একটি টেবিল, দুটি চেয়ার আর ‘যিশুর পবিত্র হৃদয়ের’ একটি ছবি।

বৃদ্ধা নিজে বসলেন, ছেলেটাকে বসতে বললেন। তারপর তার দুই হাত টেনে নিয়ে শান্তভাবে মন্ত্র জপতে লাগলেন।

বৃদ্ধাকে দেখে জিপসিদের কথাই তার মনে পড়তে লাগল। পথেঘাটে জিপসিদের সাথে তার অনেকবার দেখা হয়েছে। তারাও ঘুরে বেড়ায়, তবে তাদের ভেড়ার পাল নেই। মানুষজন বলে, জিপসিরা অন্যদের ঠকিয়ে জীবন চালায়। এমনও বলা হয়, শয়তানের সাথে তাদের সন্ধি আছে, তারা শিশুদের অপহরণ করে তাদের গুপ্ত আস্তানায় নিয়ে গিয়ে দাস বানিয়ে রাখে। ছোটকালে ছেলেটা ভয় পেত জিপসিদের হাতে বন্দি থেকে মৃত্যুকে। এই বৃদ্ধা তার হাত দুটি টেনে নিলে তার শৈশবের সেই ভয়টা এসে গ্রাস করল।

তবে সে নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল এই বলে যে, এই নারীর কাছে ‘যিশুর পবিত্র হৃদয়’ আছে। সে চাচ্ছিল না, তার হাত দুটি কাঁপতে থাকুক। কারণ তাতে এই বুড়ো নারী জেনে যাবেন, সে ভয় পাচ্ছে। সে মনে মনে বাইবেলের শ্লোক আওড়াতে থাকল।

‘দারুণ তো,’ তিনি বললেন, ছেলেটার হাত দুটি এক পলকের জন্যও না ছেড়ে। তারপর চুপ হয়ে গেলেন।

ছেলেটা নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। তার হাত কাঁপতে লাগল, বৃদ্ধা তা টের পেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি হাত দুটি ছেড়ে দিলেন।